‘প্রথম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন: দৃশ্যপট ও শিক্ষণীয়’ শীর্ষক

সংবাদ সম্মেলন

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৮ মার্চ, ২০১৬)

ব্যাপক সহিংসতার মধ্য দিয়ে প্রথম ধাপে অনুষ্ঠিত হলো ৭১২টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। ৩৬টি জেলায় অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনে ৩২টিতেই সহিংসতা ও অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচনের দিনেই বিভিন্ন ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ১১ জন এবং আহত হয়েছেন সহস্রাধিক। অনিয়মের কারণে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয় ৬৫টি কেন্দ্রে। ভোট গ্রহণ নির্বাচনের পরের দুইদিনে নির্বাচনের দিনে আহত আরও তিনজন-সহ নির্বাচনী সহিংসতায় নিহত হয়েছেন ৬ জন। আহতদের মধ্যে শতাধিক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যও রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তফসিল ঘোষণার পর থেকে নির্বাচনের পূর্বেই সারাদেশের অনেক এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ১০ জন এবং আহত হয়েছেন দুই সহস্রাধিক। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ২৭ এবং আহত সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক। নির্বাচনের পূর্বে আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে পিরোজপুরের নাজিরপুরে শামসুল হক নামে এক বিএনপি কর্মী এবং বগুড়া জেলার শিবগঞ্জের বুড়িগঞ্জে মাহতাব আলী নামে এক আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হন। প্রতিদ্বন্দ্বী সদস্য পদপ্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যকার সংঘর্ষে ভোলা সদরের চর সামাইয়া ইউনিয়নে সিরাজুল ইসলাম নামে এক দিনমজুর এবং কিশোরগঞ্জের মহিন্দর ইউনিয়নে সোহেল মিয়া নামে এক কৃষক নিহত হন। আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে বরগুনার হলদিয়া ইউনিয়নে বশির উদ্দিন, পটুয়াখালীর আদাবাড়িয়া ইউনিয়নে আশরাফ ফকির, বরিশালের সদরের ভাসানচর ইউনিয়নে সমীর চারু, যশোরের মনিরামপুর উপজেলার চালুয়াহাটি ইউনিয়নে মনসুর আলী এবং পাবনার বেড়া উপজেলার ঢালাইচর ইউনিয়নে গহের উদ্দিন নিহত হয়। উল্লেখ্য, নিহতরা সকলেই আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থক; কেননা প্রার্থীরা সকলেই আওয়ামী লীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বান্দরবানের গ্যালাইঙ্গা ইউনিয়নের জন সংহতি সমিতির সম্ভাব্য চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী শান্তি ত্রিপুরাকে রাতের আঁধারে অপহরণ করে মেরে ফেলা হয়।

নির্বাচনের দিন নিহত ১১ জনের মধ্যে পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়ার ধানীসাফা ইউনিয়নেই মারা যায় ৫ জন। জানা যায়, সাফা ডিগ্রি কলেজ কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসার কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করতে চাইলে আওয়ামী লীগ কর্মীরা বাধা দেয়। বাধা উপেক্ষা করে ফলাফল ঘোষণা করা হলে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। খবর পেয়ে প্রিসাইডিং অফিসারকে উদ্ধারে র‍্যাব ও বিজিবি কেন্দ্রে উপস্থিত হয়। এ পর্যায়ে তাদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হলে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে হতাহতের ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন মোহাম্মদ সোহেল, শাহাদাত হোসেন, কামরুল মৃধা, বেলাল ও সোলায়মান। এরা সকলেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী হারুনুর রশিদের কর্মী বলে জানা গিয়েছে। টেকনাফের সাবরাংয়ে দুই ইউপি সদস্য প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষে শফিক আলম এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়াম্যান প্রার্থীর ভাই আব্দুল গফুর নিহত হয়। দুই মেম্বার প্রার্থী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষকালে ঝালকাঠির নবগ্রামে কাশেম শিকদার এবং সিরাজগঞ্জের জয়ানপুরে পদদলিত হয়ে নওনাই বেগম নিহত হন। এছাড়াও পটুয়াখালীর বাউফলের কালিশুরী ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে হুমায়ূন মল্লিক এবং নেত্রকোণার খালিয়াজুরিতে ফলাফল ঘোষণাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ছোট ভাই আবু কাউছার নিহত হন। নির্বাচনী সহিংসতায় আহত আরও ৩ জনের মৃত্যু হয় ২৩ ও ২৪ মার্চ ২০১৬। এরা হচ্ছেন, বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন বোহাইল ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা জাবেদ আলী, কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলাধীন সাবরাং ইউনিয়নের মনির আহমেদ ও পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলাধীন বহরমপুর ইউনিয়নের শাহজাহান মৃধা। এছাড়াও নির্বাচনী সভা শেষে বাড়ি ফেরার পথে হামলায় নিহত হন চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলাধীন বারৈয়াঢালা ইউনিয়নের যুবলীগ নেতা নিয়াজ উদ্দিন নয়ন এবং বিজয়ী মেম্বার আবুল হোসেনের বিজয় মিছিল থেকে হামলায় ঢাকা জেলার কেরাণীগঞ্জ উপজেলাধীন বিলাসপুর ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের বিজিত প্রার্থী আলাল মাতবরের বড়ভাই জালাল মতবর টেটাবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। এদিকে ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলাধীন ভাইটকান্দি ইউনিয়নে এক গ্রাম পুলিশ সদস্যকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। ইউনিয়নের ৯নং ওয়ার্ডের পরাজিত ইউপি সদস্য প্রার্থী আব্দুল মজিদ ও তাঁর সমর্থকদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ এনেছে নিহতের পরিবার। এ ঘটনায় চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।

২২ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ব্যাপক সহিংস ঘটনা ঘটলেও ২৩ মার্চ টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলাধীন ১১টি ইউনিয়নে অনুষ্ঠিত নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নির্বাচন সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া:

অনুষ্ঠিত নির্বাচন সম্পর্কে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় **প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রাকিবউদ্দীন আহমদ** বলেন- বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সার্বিক বিচারে সারা দেশে নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তিনি বলেন, “অনিয়মের কারণে ৫৬টি কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে এ নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। ভোটারদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছিল, বিশেষ করে নারীদের উপস্থিতি ছিল বেশি। কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া এ নির্বাচন অবাধ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “আমরা মনে করি সব জায়গায় নয়, অল্প কিছু জায়গায় অনিয়ম হয়েছে।” তিনি সহিংসতায় নিহত ও আহত হওয়ার ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন। **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের** পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘‘দলীয় প্রতীক ও পরিচয়ে প্রথম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন যে কোনো সময়ের তুলনায় উৎসবমুখর পরিবেশে, বেশ ভালো, শান্তিপূর্ণ, সুষ্ঠু, স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বচ্ছভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ভোটাররা দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে শান্তিপূর্ণভাবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। নারীদেরও বিশাল উপস্থিতি ছিল।” আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৯৯.৭২

% ভোট সুষ্ঠু হয়েছে বলে দাবি করা হয়। **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের** পক্ষ থেকে বলা হয়, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে তারা সন্ত্রাস, কেন্দ্র দখল ও ভোট জালিয়াতির যে আশঙ্কা করেছিলেন, প্রথম ধাপের নির্বাচনে তা শতভাগ প্রমাণিত হয়েছে। তারা বলেন, ''এই নির্বাচনে সব জায়গায় অনিয়ম হয়েছে। দখল-কারচুপি হয়েছে বেশিরভাগ জায়গায়।" এই অবস্থায় তারা অন্তত ৫০টি ইউনিয়নের নির্বাচন বাতিল করে দৃষ্টান্ত স্থাপনের দাবি জানান নির্বাচন কমিশনের প্রতি। **জাতীয় পার্টির** পক্ষ থেকে কেন্দ্র দখল, দলীয় এজেন্টদের বের করে দিয়ে জাল ভোট দেওয়া, প্রার্থীদের উপর হামলা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ করা হয়েছে। তারা বলেন, "ইসি'র উপর মানুষের আস্থা নেই। আমরা লিখিতভাবে অভিযোগ করেছি, কাজ কতটুকু হবে জানি না। এরকম অনিয়ম ঘটতে থাকলে কখনও সুষ্ঠু হবে না নির্বাচন। **বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির** পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জনাব ফজলে হোসেন বাদশা বলেন, "বরিশালের উজিরপুর ও বাবুগঞ্জের বিভিন্ন ইউনিয়নে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীর পক্ষে কেন্দ্র দখল, প্রতিদ্বন্দ্বী এজেন্টদের বের করে সিল মারার উৎসব করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় প্রশাসন কেন্দ্র দখলদার ও সন্ত্রাসীদের পক্ষে ভূমিকা পালন করেছে। জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকেও এর কোনো প্রতিকার পাওয়া যায়নি।" **বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি**র সভাপতি ও বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন বলেন, "আমার নির্বাচনী এলাকা বাবুগঞ্জের তিন ইউনিয়নেই পুরো দখলের নির্বাচন হয়েছে। তবে যেসব এলাকায় ভাল নির্বাচন হয়েছে সেখানে আমরা ভাল করেছি। তবে এই নির্বাচন কমিশনের যে ক্ষমতা, তা প্রয়োগ করতে পারেনি। আমার কাছে মনে হয়েছে নির্বাচন কমিশন দুর্বল।" **পর্যবেক্ষক সংস্থা ব্রতী'র** পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, "বেশ কিছু কেন্দ্রে বুথের ভেতর ক্ষমতাসীন দলের মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের অবস্থান করতে দেখা গিয়েছে। বল প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যালটে সিল মারতে দেখা গেছে। ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেওয়া, জাল ভোট দেওয়া, নির্বাচন কর্মকর্তার উপর হামলা ও কেন্দ্র দখলের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ, হামলা ও ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে।" **মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)**-এর পক্ষ থেকে ইউপি নির্বাচনে নানা অনিয়ম ও সংঘর্ষ-সহিংসতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, গণতন্ত্র ও প্রতিনিধিত্বশীল শাসনব্যবস্থায় এসব কোনোভাবেই কাম্য নয়। সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইসি ও সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে আসক। **স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ** এই অবস্থাকে অভিহিত করেছেন "নির্বাচনী ব্যবস্থার অবনতির এক প্রকট প্রকাশ" বলে। তাঁর মতে ১৯৮৮ সালের পর এটাই ছিল সবচেয়ে কলঙ্কিত ইউপি নির্বাচন।

প্রতিক্রিয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বক্তব্যের ধারা একরকম হলেও, অন্যান্যদের আর এক রকম বলে মনে হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদনের চিত্রঃ গণমাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত প্রতিবেদনে নির্বাচনের যে চিত্র উঠে এসেছে তা নিম্নরূপ-

- ভোটকেন্দ্রে প্রতিপক্ষের এজেন্টদের ঢুকতে না দেওয়া বা ভোটকেন্দ্র থেকে বেড় করে দেওয়া;
- বুথ দখল করে বা ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সিল মারা;
- লাইনে দাঁড়িয়ে জ্যাম সৃষ্টি করে ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা;
- ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা;
- ভোটকেন্দ্রের বাইরে পেশিশক্তি প্রদর্শন;
- নির্বাচন কর্মকর্তাকে গুলি করে আহত করা;
- চেয়ারম্যান প্রার্থীকে প্রকাশ্য ভোট দিতে বাধ্য করা (এক্ষেত্রে ভোটদানের জন্য দাঁড়ানো লাইনের আশেপাশে ঘুরে দলীয় কর্মীদের ভোটাদের শোনাতে দেখা গিয়েছে- 'চেয়ারম্যানের ভোট ওপেনে, অন্যদের ভোট গোপনে');
- ভোটারদের হাতে শুধুমাত্র সদস্য পদপ্রার্থীদের ব্যালট পেপার দেওয়া;
- নির্বাচনী কর্মকর্তা কর্তৃক ব্যালট পেপারে সিল মারা বা সিল মারতে সহায়তা করা;
- নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনকালে ও নির্বাচনের পর ব্যাপক সহিংসতা, হামলা, ভাংচুর, লুট-পাট, অগ্নি-সংযোগ;
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, ভাংচুর, লুট-পাট, অগ্নি-সংযোগ, দেশত্যাগের জন্য হুমকি প্রদান;
- পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঝালকাঠির রাজাপুর, বরিশালের বাকেরগঞ্জ, ভোলার ইলিশা, পটুয়াখালীর কলাপাড়া, কক্সবাজারের টেকনাফ এবং সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গুলি চালানো ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হানাহানির অভিযোগ সরকার দলীয় প্রার্থী বা দলসংশ্লিষ্ট স্বতন্ত্র প্রার্থীর বিরুদ্ধে উঠেছে। এখনও নির্বাচনী সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। এক কথায় সারাদেশে এক ভীতিকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে।

সুজন-এর পর্যবেক্ষণঃ

আমরা সুজন-এর পক্ষ থেকে এই নির্বাচনকে দেখতে চাই আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের ('সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ' ও 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেন্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস') ভিত্তিতে; যাতে বলা হয়েছে, ৫টি বিষয়ের নিরিখে বলা যায় নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে কি না। বিষয়গুলো হচ্ছে, ১. ভোটার তালিকা প্রস্তুতের প্রক্রিয়ায় যাঁরা ভোটার হওয়ার যোগ্য ছিলেন, তাঁরা ভোটার হতে পেরেছেন; ২. যাঁরা প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন, তাঁরা প্রার্থী হতে পেরেছেন; ৩. ভোটারদের সামনে বিকল্প প্রার্থী ছিল; ৪ যাঁরা ভোট দিতে চেয়েছেন, তাঁরা স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পেরেছেন এবং ৫. ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল স্বচ্ছ, কারসাজিমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য। এই পাঁচটি মানদণ্ডের ক্ষেত্রে 'হ্যাঁ বোধক' উত্তর আসলেই আমরা বলতে পারি যে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে – যা আমরা প্রথম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বলতে পারছি না; কেননা প্রতিটি মানদণ্ডের উত্তরই এখানে 'না বোধক'।

নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই আমরা বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম প্রত্যক্ষ করছি। সে কারণে আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসবে অনিয়মও তত বৃদ্ধি পাবে এবং নির্বাচনের দিন তা হয়তো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আমাদের ধারণাই সত্য হয়েছে। আমরা অনেক আগে থেকে এও বলে আসছিলাম যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাচন রাজনৈতিক দলভিত্তিক হওয়া উচিত নয়। আমাদের বক্তব্য ছিল, দলভিত্তিক স্থানীয় সরকার নির্বাচন বিরাজমান 'দুর্বৃত্তায়িত রাজনৈতিক সংস্কৃতি'র নেতিবাচক প্রভাবকে গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করবে। এখন সত্যি সত্যিই 'দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি' আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থাকে বিতর্কিত করে ফেলছে।

নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমাদের গোচরে এসেছে। বিষয়গুলোর বর্ণিত হলো:

প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া:
প্রার্থী মনোনয়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে, অনেক স্থানের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এবং আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য বিদ্রোহী প্রার্থীরা ভয়-ভীতি প্রদর্শন, বাধা দান, কেড়ে নেওয়া বা ছিঁড়ে ফেলার কারণে মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারেননি। কেউ কেউ মনোনয়নপত্র দাখিল করলেও ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও চাপ সৃষ্টির কারণে প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন। ছোট-খাটো বা সংশোধনযোগ্য ত্রুটির কারণে যাচাই-বাছাই কালে বাতিল হয়ে গেছে অনেকের মনোনয়নপত্র। ফলে একদিকে যেমন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার ঘটনা ব্যাপকহারে (৫৪টি) ঘটেছে, অন্যদিকে ব্যাপক সংখ্যক ইউনিয়নে (১২১টি) বিএনপি'র প্রার্থী না থাকার ঘটনা ঘটেছে। উপরোল্লেখিত কারণসমূহসহ দলভিত্তিক নির্বাচনের কারণে চেয়ারম্যান পদে অতীতের তুলনায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। দলভিত্তিক নির্বাচনের করণে, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক আবশ্যিকভাবেই প্রার্থী মনোনয়ন প্রদানের বিধান করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে যে, বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলো, বিশেষ করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ব্যাপক মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। অর্থের বিনিময়ে, অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মনোনয়ন প্রদান করায় দলের অনেক যোগ্য, জনপ্রিয় ও ত্যাগী নেতা-কর্মী বাদ পড়েছেন এবং অনেক অযোগ্য ও অন্য দলের (বিএনপি-জামায়াতসহ) দলছুট ব্যক্তিরা মনোনয়ন পেয়েছেন। আমরা মনে করি, ব্যাপক সংখ্যক বিদ্রোহী প্রার্থীর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার একটি বড় কারণ যোগ্য ও জনপ্রিয়দের বাদ পড়া এবং অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মনোনয়ন প্রদান।

নির্বাচনী আচরণবিধি ও সহিংসতা প্রসঙ্গ:
নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই প্রার্থী ও সমর্থকদের মধ্যে বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী-সমর্থক এবং দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী স্বতন্ত্র (বিদ্রোহী) প্রার্থী ও কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে আচরণবিধি মেনে না চলার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। ফলে নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যাপক সহিংসতা লক্ষ করা গিয়েছে। নির্বাচনী সহিংসতায় এ পর্যন্ত ২৭ জন নিহত ও সাড়ে তিন হাজারেরও অধিক আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। নির্বাচনী সহিংসতার একটি বড় কারণ নির্বাচনকে প্রতিযোগিতার মনোভাব থেকে গ্রহণ না করে, মরিয়া হয়ে জয়ের প্রচেষ্টা চালানো। ক্ষমতাসীন দলের বেশ কয়েক জন সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধেও আচরণবিধি ভঙ্গের অভিযোগ উঠেছে জোরেশোরেই; যাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

উল্লেখ্য, শুধুমাত্র নির্বাচনের পূর্বে বা নির্বাচনের দিনেই না, নির্বাচন পরবর্তীকালেও কোনো কোনো নির্বাচনী এলাকায় সহিংসতার খবর পাওয়া যাচ্ছে। ২৪ মার্চ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। বাগেরহাটের চিতলমারী ও ফকিরহাট এবং বরিশালের বানারীপাড়া, গৌরনদী, আগৈলঝাড়া ও উজিরপুরের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। পিরোজপুরের ভান্ডারিয়াতেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে এবং অনেকে আত্মগোপন করে আছেন বলে জানা গিয়েছে। কোথাও কোথাও হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজনকে দেশত্যাগের হুমকিও দেওয়া হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ:
নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকেই নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। আইনি ভিত্তির উপর দাড়িয়ে নির্বাচন কমিশনকে কখনও নিরপেক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। গণমাধ্যমে মনোনয়নপত্র জমাদানে ব্যাপক অনিয়মের খবর প্রকাশিত হলেও বিষয়টি কমিশন সেভাবে আমলে নেয়নি। চেয়ারম্যান পদে প্রথম ধাপে ২৫টি এবং দ্বিতীয় ধাপের জন্য ১৩টি ইউনিয়নে শুধুমাত্র ১টি করে (বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে) মনোনয়ন পত্র দাখিল হলেও এবং অনিয়মের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলেও, নির্বাচন কমিশন বিষয়টি তদন্ত করে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বরং কমিশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে, অভিযোগ না পেলে তারা কোনো অনিয়মের বিষয়কে আমলে নেবে না। অভিযোগ করা হলে বলা হয়েছে, অভিযোগ সুনির্দিষ্ট নয়। এমনকি সুস্পষ্টভাবে অভিযোগ করলেও তারা ব্যবস্থা গ্রহণ না করে পদক্ষেপ গ্রহণের দায় চাপিয়েছে কখনও রিটার্নিং অফিসার বা কখনও স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের উপর। আমরা জানি যে, বাংলাদেশের বিরাজমান রাজনৈতিক বাস্তবতায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্টদের স্থানীয় প্রভাবশালী কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এক রকম দুঃসাধ্যই বলা যায়। কমিশনের জন্য যা ছিল অপেক্ষাকৃত সহজ।

নির্বাচনের আগের দিন গণমাধ্যমের কাছে দেওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের বক্তব্যকেও আমরা যথাযথ মনে করি না। তিনি যখন বলেন, "আমরা নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্রের অন্য বিভাগের ওপর নির্ভরশীল। যে কারণে তাদের উপর আমাদের কর্তৃত্ব কম। কাঙ্ক্ষিত

সহযোগিতা পাই না। সেজন্য মারপিট হানাহানি অব্যাহত আছে। নির্বাচন অর্থকেন্দ্রিক হয়ে গেছে।' পাশাপাশি যখন বলেন, 'নির্বাচনে সহিংসতা আমাদের চরিত্রগত। নির্বাচনের এই চিত্র আগে থেকেই আমরা বহন করে চলেছি। তাই এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি না। এটি নিয়ন্ত্রণ করতে সময় লাগবে' তখন নির্বাচন কমিশনের অসহায়ত্বই প্রকাশ পায়। তার এই বক্তব্য মানুষের মধ্যে আস্থা সৃষ্টির পরিবর্তে শঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

কোনো অনিয়ম হলে নির্বাচন কমিশন দায় নেবে না বলে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন, তাও যৌক্তিক নয় বলে আমরা মনে করি। যেহেতু নির্বাচন পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের, তাই অনিয়মের দায়ও তাঁদেরই।

নির্বাচন কমিশনের কয়েকটি পদক্ষেপকে আমরা ইতিবাচক বলে মনে করি, তা হচ্ছে, একাধিক স্থানে মনোনয়নপত্র জমাদানের বিধান; ভবিষ্যতে অনলাইনে মনোনয়ন পত্র জমাদানের ব্যবস্থা করার ঘোষণা; ফেনী জেলার পরশুরাম উপজেলাধীন ৩টি ইউনিয়নে চেয়ারম্যান পদে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের ১টি করে মনোনয়নপত্র জমা হওয়ায়, ঐ তিন ইউনিয়নের নির্বাচন প্রক্রিয়া স্থগিত করা ইত্যাদি। অবশ্য অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমাদানের বিধান করাসহ একাধিক স্থানে মনোনয়নপত্র জমাদানের বিধান করার দাবি সুজন আগে থেকেই করে আসছিল এবং গত ২ মার্চ ২০১৬ তে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনেও আমরা এই দাবিগুলো তুলে ধরেছিলাম।

তবে নির্বাচনী দায়িত্বে অবহেলার কারণে সাতক্ষীরার পুলিশ সুপারকে তলব করাসহ ১১ জনকে পুলিশকে বরখাস্ত করার উদ্যোগ গ্রহণের যে ঘোষণা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে ২৭ মার্চ ২০১৬ তারিখে কালের কণ্ঠে "ইসির নির্দেশ উপেক্ষা ভোট লুট মামলার আসামিদের নিয়ে সাতক্ষীরা এসপির সভা, মিষ্টিমুখ" শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "প্রথম ধাপের ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ভোট লুটে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা মানছেন না সাতক্ষীরার পুলিশ কর্মকর্তারা। কমিশন যাদের গ্রেপ্তার করতে নির্দেশ দিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার তো করাই হয়নি, বরং তাদের সঙ্গে সভা করে মিষ্টি বিতরণ করেছেন পুলিশ সুপার এবং অন্য কর্মকর্তারা। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন সাতক্ষীরার পুলিশ সুপার ও পাঁচটি থানার ওসিদের নির্বাচন কমিশনে এসে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য তলব করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" আমরা বিষয়টি দেখার অপেক্ষায় আছি।

তবে জনমনে এ প্রশ্নও ওঠা শুরু হয়েছে যে, নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কারা এবং কবে ব্যবস্থা নেবে?

নির্বাচনী ফলাফলঃ

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ৬৪০টি ইউনিয়নের নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায়, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৪৬৯টি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ৪৯টি জাতীয় পার্টি-জেপি ৭টি, জাসদ ৩টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ২টি, জাতীয় পার্টি ২টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ১টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ১০৭টি ইউনিয়নে জয়ী হয়েছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল যথাক্রমে ৩৬.৪৮% ও ১১.৫০% ভোট পেয়েছে (*প্রথম আলো*, ২৫ মার্চ,২০১৬)। টাঙ্গাইল জেলার নাগরপুর উপজেলার ১১টি ইউনিয়নের ৪টিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪টিতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ৩টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়ী হয়েছে। স্বতন্ত্র ৩ জনের মধ্যে ১ জন আওয়ামী লীগ এবং আর একজন বিএনপির বিদ্রোহী। এছাড়াও ৫৪টি ইউনিয়নে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। উপরোক্ত হিসাব থেকে দেখা যায় যে, মোট ৭০৫টি ইউনিয়নের মধ্যে ৫২৭টিতে আওয়ামী লীগ, ৫৩টিতে বিএনপি এবং ১১০টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন।

আমরা মনে করি, এই ধরনের ফলাফলের প্রধান কারণ একটি প্রভাবিত ও দখলদারিত্বমূলক নির্বাচন। এছাড়াও নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে পুরো নির্বাচন জুড়েই 'লেভেল প্লেয়িং' অবস্থান থেকে কাজ করতে পারেনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। ১২১ টি ইউনিয়ন ছিল বিএনপি প্রার্থীশূণ্য। এই নির্বাচনের ফলাফল ভোটারদের কাছে যেমন প্রশ্নবিদ্ধ, বিএনপির কাছে তেমনি হতাশার। নির্বাচনের এই ধারা চলতে থাকলে দলটি ভবিষ্যতে নির্বাচনে অংশগ্রহণের উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে পারে। তবে বিএনপিরও খতিয়ে দেখা প্রয়োজন যে, ফলাফল বিপর্যয়ের অনেকগুলো কারণের মধ্যে ভোটার বিমুখতাও একটি কিনা? বিএনপিকে ভাবতে হবে, নেতৃত্বের দুর্বলতা, নির্বাচনের মাঠে নেতা-কর্মীদের অনুপস্থিতি, ত্রুটিপূর্ণ আন্দোলন কৌশল, স্বাধীনতা বিরোধীদের সাথে গাঁটছড়া ইত্যাদি কারণেও তাদের প্রতি ভোটাররা ধীরে ধীরে বিমুখ হচ্ছে কিনা?

পরিশেষে, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন তথা সরকারের ভূমিকা অপরিহার্য। একইসাথে রাজনৈতিক দলের সদাচারণও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের সবচেয়ে বড় দায় নির্বাচন কমিশনের। নির্বাচন কমিশনকে মনে রাখতে হবে যে, নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তাঁরাই। সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা তাঁদেরই দায়িত্ব। আমরা সকলেই মনে করি যে, নির্বাচন কমিশনকেই এ দায়িত্ব পালন করতে হবে।

আমরা সকলকে এও মনে করিয়ে দিতে চাই যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রণীত আমাদের রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল পবিত্র সংবিধানে 'গণতন্ত্র'কে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আর নির্বাচন হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রথম ধাপ। তাই কোনো অবস্থাতেই নির্বাচন পদ্ধতিকে ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ প্রথম আলো, ইত্তেফাক, যুগান্তর, কালেরকণ্ঠ, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও আমাদের সময়-এ প্রকাশিত খবর এই নিবন্ধের তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।